The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0003

মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা

গুলশান আরা *

Abstract: Muhammad Abdul Hai (26 November, 1919—3 June, 1969) is one of the most renowned linguist, educationist and researchers of Bangla language and linguistics. He is also a very significant figure in the study of Bangla literature. Professor Hai was the first muslim student of the Department of Bengali, University of Dhaka, who obtained first class both in BA (Hon's) and masters dgree in 1941 and 1942 respectively. He joined as a lecturer at the department of Bengali and Sanskrit, University of Dhaka in 1949. His most mentionable and unique research work in linguistics is *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali*. *Toshamod o Rajniteer Bhasha* (Flattery and the Language of Politics) is a compilation of 23 various types of articles and short stories which were published in different journals in the year of 1940 to 1958 and published as a book in 1959. The name of the book is very attractive and all the contents seems to primarily be sociolinguistic, though only seven of them are linguistic ones. This book contains some very important linguistic topics such as 'Bhashar Kotha', 'Kotha Shekha', 'Dhonir Babohar', 'Bhasha o Bektitto', 'Shubhashon', 'Toshamoder Bhasha' and 'Rajniteer Bhasha'. The Present article aims at analysing all the articles of the book *Toshamod o Rajniteer Bhasha* with an emphasis on the linguistic ones.

Keywords: Language of Politics, Language of Flattery, Euphemism, Sociolinguistics

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষার অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী ও বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক। এই অঞ্চলে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আধুনিক তথা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় তাঁরই মাধ্যমে। উনিশ শতকের পাঁচের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল, তার মূল কৃতিত্ব মুহম্মদ আবদুল

* অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাইয়ের। মুহম্মদ আবদুল হাই বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (ঢাকা: গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী, ১৯৫৯) - নিখাদ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো গ্রন্থ নয়, ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে রচিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত মোট ২৩টি, মূলত সামাজিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ছোট গল্প ও ভ্রমণ কাহিনির বিচিত্র স্বাদের একটি সংকলন। মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের খ্যাতি ভাষাবিজ্ঞানী তথা ধ্বনিবিজ্ঞানী হিসাবে হলেও এ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যিক মানসের প্রতিফলন দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তরুণ আব্দুল হাই বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি-সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার, অধ্যাপক গণেশ চরণ বসু, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, কবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেন। এঁদের নিবিড় সান্নিধ্য তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছে –এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ১৯৩৮ সালে বাংলা বিভাগ থেকে শিক্ষাভ্রমণে শান্তি নিকেতন গমন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য লাভ, তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। ধ্বনিবিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের পদাচারণা ছিল ভাষাবিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায়, "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" ধ্বনিবিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ শীর্ষক ছাত্রপাঠ্য একটি ব্যাকরণও তিনি রচনা করেছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ, লোকসাহিত্যসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তাঁর সপ্রতিভ বিচরণ লক্ষণীয়।

২. মুহম্মদ আবদুল হাই: শিক্ষা ও কর্মজীবন

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল গণি এবং মাতার নাম ময়মুন্নেসা খাতুন। তিনি ১৯৩৬ সালে উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৩৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। একই বছরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগে অনার্স শ্রেণিতে ভর্তি হন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৪১ সালে বিএ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৪২ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসাবে উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৪৯ সালে বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং পরের বছর ১৯৫০ সালে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য লন্ডন গমন করেন। ১৯৫২ সালে ডিস্টিংশনসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং বিভাগে ফিরে এসে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ২২টি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। এছাড়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ দেশি ও বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় মাত্র ৫০ বছর বয়সে মুহম্মদ আবদুল হাই মৃত্যু বরণ করেন।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে[১] মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* – গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলোর একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। বর্ণনামূলক এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য দ্বৈতয়িক উৎস হিসাবে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক ও জার্নালের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৪. সাহিত্য-পর্যালোচনা

কাজী মোতাহার হোসেন তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা নামক প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রচনাবলি কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সময়কালের রচনা যা মূলত গল্প, আত্মকথা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে সৃষ্ট সাহিত্য, যেগুলোর মধ্যে ‘ ওস্তাদজি’ নামক অনুভূতিপ্রধান মনস্তাত্ত্বিক ছোট গল্পটি শ্রেষ্ঠ রচনা। দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত রচিত সাতটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ। এ সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন বলেন “ ভাষাতত্ত্ব তো ব্যাকরণ জাতীয় জিনিস, কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লেখক যেন বোবা ‘তত্ত্ব’কেও কথা বলিয়ে ছেড়েছেন”(মনিরুজ্জামান, ২০০০: ১৩৯)। তিনি মনে করেন, প্রায় সতের আঠার বছর ধরে জমে ওঠা লেখাগুলোর মধ্যে শৈলীগত এবং গুণগত কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ দ্বারা দুটি পৃথক বই রচিত হলে প্রথমটি মাঝারি গোছের এবং দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্টমানের বই হতো। আজাহারউদ্দীন খান ‘ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, “তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা গ্রন্থে শেষ সাতটি প্রবন্ধে কোনো তত্ত্বের আলোচনা নেই”। (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ১১৪)। “ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই” প্রবন্ধে মনসুর মুসা উল্লেখ করেন আলোচ্য গ্রন্থটি সমাজভাষাতত্ত্বে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আগ্রহের প্রমাণ। তবে হুমায়ুন আজাদ তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা গ্রন্থ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ বলেন, “তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা”র নামটি চমৎকার ও বিভ্রান্তিকর; নাম শুনে এটিকে সমাজভাষাতাত্ত্বিক বই মনে হয়, যদিও বইটি তা নয়” (আজাদ, ১৯৯৪: ছয়)। গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,” তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯) নামে তাঁর আকর্ষণীয় ও বিভ্রান্তিকর যে-বইটি রয়েছে, তাতে ছাপা হয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ লেখা, ওই লেখাগুলো থেকে বোঝা যায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ঝোঁক ছিলো রম্য-রচনার প্রতি, যাতে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীকে এবং সৌন্দর্যত...ষ্ণাও ছিলো তাঁর প্রবল। এ-রম্যতা ও সৌন্দর্যত...ষ্ণাকে দমন করে তিনি পাণ্ডিত্যধর্মী প্রবন্ধ লেখায় ক্রমশঃ মন দেন, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ওসব প্রবন্ধ লেখা জরুরী হয়ে ওঠে তাঁর জন্য” (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ২১১)।

৫. তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়

সামনের মাস; প্রথম প্রকাশ *আজাদ*, ১৩ জুলাই ১৯৪৭

ওরা ও আমরা; *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র, ১৩৫৩ (১৯৪৬)

যুগস্রষ্টা জিন্নাহ; *মাসিক মোহাম্মদী*, পৌষ, ১৩৫৩ (১৯৪৬)

রস; *নয়াজামানা*; ২০শে চৈত্র ১৩৫৪

এই জিন্দেগীর ঈদ; *জিন্দেগী*-ঈদসংখ্যা ১৩৫৪ (১৯৪৭)

সুন্দরের নিমন্ত্রণ; *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ই আষাঢ়, ১৩৫৬ (১৯৪৯)

সুন্দর লোকে; *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা শ্রাবণ, ১৩৫৬ (১৯৪৯)

মহাভয়–মহৎগুণ; *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ, ১৩৫৪ (১৯৪৭)

কৈফিয়ৎ; *মাসিক মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ (১৯৪৬)

সাহিত্যিকের জবানবন্দী; *মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ, ১৩৫৩ (১৯৪৫)

ওস্তাদজী; *মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ ১৩৫১

বেসুর; *মাসিক মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৫৪ (১৯৪৭)

ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর; *বর্ষলিপি*, ১৩৬১

তিস্তা; *নদী পরিক্রমা*

সুরমা; *নদী পরিক্রমা*

শিলিংএ মে মাস; *মুসলিম হল বার্ষিকী*, ১৯৪০

ভাষার কথা; *এলান*, ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয়পক্ষ ১৯৫৪

কথা শেখা; *মুসলিম হল বার্ষিকী*, ১৯৫২-৫৩

ধ্বনির ব্যবহার; ঈদসংখ্যা *ইত্তেফাক*, ১৯৫৮

ভাষা ও ব্যক্তিত্ব; *শিক্ষা পরিচয়*, ২য় সংখ্যা ১৩৬৩

সুভাষণ; *মাহেনও*, আগস্ট ১৯৫৪

তোষামোদের ভাষা; সমকাল, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৬৪

রাজনীতির ভাষা; সমকাল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

৫.১ সামনের মাস

গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত প্রথম নিবন্ধ 'সামনের মাস' শোষণ-নির্ভর সমাজের স্বল্প আয়ের দারিদ্রপীড়িত মানুষের দৈনন্দিন টানাপোড়েনের চিরচেনা কাহিনি। এতে সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হওয়া নির্বিত্ত, সুবিধাবঞ্চিত ও নিপীড়িত প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রাম ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণা চিত্রিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এই রচনায় দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার করুণ চিত্র

প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবারের প্রত্যাশার চাপ আর অপ্রাপ্তির বেদনা যন্ত্রনাবিদ্ধ করে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর সুতীব্র ইচ্ছেগুলো ভবিষ্যতের নিকষ কালো গহ্বরে জমা রাখার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিদিনের যে প্রাণান্তকর চেষ্টা, এই প্রবন্ধে করুণভাবেই তা ফুটে উঠেছে । বড় মেয়ের কানের দুল, মেজো মেয়ের ফ্রক, ছোট মেয়ের কালার বক্স আর ছেলের কলম কিনে দেওয়ার আবদার, সবই সামনের মাস কিংবা তার পরের মাসে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কেবল মিথ্যা আশ্বাস, তা গৃহকর্ত্রী বুঝতে পারলেও নিশ্চুপ থাকেন কারণ তিনি জানেন, যে-কোনোভাবে পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। এই প্রত্যাশারও যেন কোনো শেষ নেই, আছে কেবল 'দাও' রব, যা নিরুপায় পিতার অসহায়ত্বকে প্রতিনিয়ত আরো স্পষ্ট করে তোলে। কাহিনিটি আটপৌরে জীবন যাপনের বাস্তব চিত্রই কেবল নয়, এর মধ্যে রয়েছে গভীর একটি বার্তা, যা কালোত্তীর্ণ, বর্তমানে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ– "এ মাস ও এদিন পারগাছদের; কিন্তু সামনের মাস গরীবের। ধনীরা এ মাসে আমোদ করে, এ দিনে খায় আর গরীবেরা এ দিনে উপোস করে, এ মাসে শুকোয় আর সামনের মাসের দিকে চেয়ে থাকে.... এ মাস চোরাকারবারে ফেঁপে উঠা ধনীর সহজ সুখের আশ্রয় বড়ো কনট্রাক্টারের সুখ নিদ্রা, আর সুযোগসন্ধানী নরনারীর চকিত থাকা" (আজাদ, ১৯৯৪: ২০৭)। সামনের মাসের সুখস্বপ্নে বিভোর গরিবের মুসকিল আহসানকারী সামনের সেই সুবর্ণকাল কখনই আসে না। আক্ষেপের সুরে বাংলার যে দুর্দিনের কথা তিনি বলেছেন, সে দুর্দিন কালের পরিক্রমায় বিলীয়মান তো নয়ই বরং আরো ঘনীভুত হয়েছে, "বাঙলার আজ দুর্দিন, সকল বাঙালীরই। যাদের নয় তারা ত সমাজের পরগাছ" (*মুহম্মদ* আজাদ, ১৯৯৪: ২০৬)— পরগাছা বলতে তিনি অসৎ এবং সুবিধাবাদীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বর্তমানের পরগাছা স্বাধীন বাংলাদেশেরই অসাধু, স্বার্থবাদী, আত্মসুখ পরায়ন ব্যক্তিবর্গ, যাদের কাছে নিজ ও নীচ স্বার্থ ব্যতিত দেশাত্মবোধসহ সবই তুচ্ছ। তৎকালীন এই পরগাছাদের স্থান, কাল, পাত্র পাল্টালেও পাল্টায়নি চরিত্র, বাংলাদেশে আজ এদেরই দৌরাত্ম। মোহগ্রস্ত গরিবের আশায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকার অবলম্বন কাল্পনিক "সামনের মাস"— কে তাই লেখক জানান 'মোবারকবাদ'। এই প্রবন্ধে লেখকের তীক্ষ্ণ জীবন-বীক্ষা শোষণ-নির্ভর সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বৈষম্যের স্বরূপ যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে।

৫.২ ওরা ও আমরা

একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের কারণে চিন্তা-চেতনায় ও জীবনাচারে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে । ১৯৪৬ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ওরা ও আমরা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধটিকে কাজী মোতাহার হোসেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বির্তকমূলক রচনা বলে মন্তব্য করেছেন (আজাদ, ২০০০: ১৩৮) । মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন ধর্ম চর্চা থেকে শুরু করে

জীবনাচার– সর্বত্রই হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য, তাই তারা কখনই এক হতে পারে না:

> ওরা আমরা মিলে ও ভারতভূমির এক তারা হবো কি করে? ওরা উপাসনা করে বহুকে, আমরা করি একের। ওরা পূর্বদিকে আমরা পশ্চিমে। তাই নয়, ওদের সবদিকেই চলে, আমাদের একদিকে। ওদের বহু দেবতা। চাঁদ-সূরুজ আর গ্রহতারা, জীবজন্তু আর পশু-পাখী, কীটপতঙ্গ, শিলা আর পাষাণে ওদের ভক্তি। অশ্বথ গাছ আর তুলসীতে ওদের মুক্তি। গরু ওরা পূজো করে, আমরা খাই। গোবর ওদের পবিত্র ভক্ষ্য আমাদের কাছে বিষ্ঠা বলে ঘৃণার্হ। ওরা প্রকৃতির উপাসক আর আমরা চাই প্রকৃতিকে দাস বানিয়ে নিজের কাজে লাগাতে। আমাদের কাছে প্রকৃতি অতি সাধারণ। জড় জগতের রহস্য যেটুকু থাকা সম্ভব তাই আছে ওর মধ্যে। বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে পারি তাতে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে ওর পূজা আমাদের কাছে অসহ্য। মানুষ বড়ো হলে তাঁকে শ্রদ্ধা করি, অনুসরণও করি। তাঁকে নিত্য স্মরণীয় করে রাখি, কিন্তু ভগবান বলে পূজো করি না। (আজাদ, ১৯৯৪: ২১০)।

জীবনদর্শন, উপাস্য, উপাসনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিপদে, প্রতিক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে সীমাহীন দূরত্ব, লক্ষ যোজন ব্যবধান, তা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অবদানে "...এ ভারতভূমিকে ওরা আর আমরা দুপাশ থেকে করলাম সমৃদ্ধ" (*আজাদ*, ১৯৯৪: ২০৯)। সম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল, উপমহাদেশে বসবাসকারী হিসাবে সমগ্র ভূখণ্ডের পরিচয় নির্ধারণে উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। দূরদৃষ্টি তাঁকে সচেতনতা দান করেছে, তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতা একান্তই পরিহারর্য। (*আজাদ*, ১৯৯৪: ২১২) ভিন্ন জীবনদর্শন ও জীবনাচার ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং এর ফলস্বরূপ ধর্মভিত্তিক দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিকতই লেখকা এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী উত্থাপন করে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন, উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে আন্দোলন রাতরাতি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। দ্রত ছড়িয়ে পড়া এই ভয়াবহ দাঙ্গায় মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে চার হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং লক্ষাধিক মানুষ হয়ে পড়েছিল গৃহহীন। এই রক্তাক্ত সহিংসতা নোয়াখালী, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, এর ফলে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করে। ভয়াবহ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছিল (ইসলাম, খণ্ড-২, ২০০৩: ১৮৮)। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন আন্দোলনের সমর্থনে লেখা এই রচনাটির জন্য আবদুল হাই কারো

কারো বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই রচনাটি *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় ১৩৫৩ সালের চৈত্র মাস সংখ্যায় "তোমরা ও আমরা" নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হয়। *শনিবারের চিঠি* স্যাটায়ারধর্মী সাহিত্যি সাময়িকী যা যোগানন্দ দাস-এর সম্পাদনায় ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন সজনীকান্ত দাস, যিনি একাদশ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য- এর ভাষা ছিল অত্যন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক এবং জ্বালাময়ী। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-শরৎচন্দ্র-নজরুল কেউই এর হাস্য-কৌতুক এবং তীর্যক মন্তব্যের হাত থেকে নিস্তার পাননি। এই পত্রিকার "সংবাদ সাহিত্য" অংশে সমসাময়িক কালের সাহিত্য সংবাদ প্রকাশ করে কৌতুক ও রম্য ধাঁচের বিরূপ মন্তব্যের মাধ্যমে আক্রমণ করা হতো (দাস, ২০১৯: ১৮)।

৫.৩ যুগস্রষ্টা জিন্নাহ

মুহম্মদ আবদুল হাই 'যুগস্রষ্টা জিন্নাহ' প্রবন্ধে যুগমানবরূপে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এক মহিমান্বিত রূপ চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ব্যক্ত করেছেন। বলিষ্ঠ চিন্তানায়ক জিন্নাহ কর্ণধার হয়ে মৃতপ্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, জাতির মুক্তির দিশারী, শুধু মুসলমান নয় সব মানুষকেই অধিকার সচেতন করে তুলেছেন, লেখকের দৃষ্টিতে নবযুগের সূচনাকারী জিন্নাহ তাই হয়ে উঠেছেন 'যুগস্রষ্টা'। স্পষ্টতই বোধগম্য, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল, তাঁর মতে, "একটা জীবনে চরমতম আঘাত পাওয়ার পর তাদের সুপ্তির বেড়া ভেঙে যে মুক্তির সন্ধান আজ তারা পেতে যাচ্ছে তার পেছনে আছে এমনতর বলিষ্ঠ কর্মী ও চিন্তানায়কের সারা জীবনের সাধনা। তাঁরই অফুরন্ত কর্মক্ষমতা ও প্রেরণায় আজ শুধু ভারতের মুসলমান জাগেনি, জেগেছে এদেশের মাটির মানুষ আর অবহেলিত লাঞ্ছিত মানবতা" (আজাদ, ১৯৯৪: ২১৫)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) ছিলেন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল। দেশ বিভাজনের পর তাকে 'কায়েদে আজম' (মহান নেতা) ও 'বাবায়ে কওম' (জাতির পিতা)-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে ভারতের মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় ছিল না, মূলত ধর্ম ছাড়া তাদের আর কোন যোগসূত্রই ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগোষ্ঠীর ৯০ ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটাও আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি পাঞ্জাবের মুসলমানরাও পুনরুজ্জীবিত মুসলিম লীগের প্রতি অনাগ্রহী ছিল। ভারত বিভাজন প্রশ্নে সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানরাও কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। ১৯৪০ সালে জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং একই বছরে

লাহোর প্রস্তাবে এই দাবি উত্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্ষমতা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়, ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে কারণ জিন্নাহসহ মুসলিম রাজনীতিবিদেরা কংগ্রেস প্রস্তাবিত ভারত রাষ্ট্রের জন্য ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ছিলেন না। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ হরতাল আহ্বান করে যা "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" হিসেবে পরিচিত। ঐদিন নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞে ৪০০০ মানুষ নিহত হয়, যেখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি ছিল। কলকাতা থেকে বিহার ও নোয়াখালীতেও এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বিহারে ৮০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং যুক্ত প্রদেশেও অনেক মুসলমান নিহত হয়। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত আলাদা দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে (ইসলাম, খণ্ড-৮, ২০০৩: ৩৯২)।

৫.৪ রস

শিল্পের আস্বাদন রসের আস্বাদনেরই নামান্তর। 'রস' প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই শিল্প-সাহিত্যের রসাস্বাদনের সাথে জিহ্বার রসাস্বাদনের তুলনা করে এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিমূর্ত সাহিত্যরসের প্রকৃত আস্বাদন ঘটে হৃদয়ে। "বাইরের রসের প্রভাবস্থল মানুষের জিব ও মুখ আর মানুষের জীবনের ঘটনাজাত ভাষা বা কথাধৃত রসের প্রভাবস্থল তার হৃদয়। মন, বুদ্ধি বা মাথাকে তা নাড়া দেয় না। রসের সম্বন্ধ মাথার সংগে নয়, তার কারবারের কারখানা মানুষের হৃদয়" (আজাদ, খণ্ড-২, ১৯৯৪: ২১৬)। তিনি সাহিত্যে শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, বীর, রুদ্র, ভয়, করুণ, অদ্ভূত ও শান্ত –এ কয়েকটি রসের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব রসের স্বরূপ উদঘাটনে হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। টক-ঝাল-মিষ্টি-তিতা কিংবা কষ যেকোনো স্বাদই মানুষকে যেমন আলোড়িত করে, ঠিক তেমনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভালো-মন্দ বা প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত সকল অভিজ্ঞতাই ভাষা-ছন্দে তার হৃদয়কে প্রভাবিত করে, রসাসিক্ত আর আপ্লুত করে তোলে। কেবল বাহ্যিক বিচার নয়, প্রকৃত শিল্পে শিল্প রসের উপস্থিতি অবধারিতভাবে থাকতেই হবে। বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় শিল্পকে দেখেছেন জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে। শ্রেষ্ঠ ও সার্থক শিল্প হবে সহজ ও সর্বজন বোধগম্য। যদিও তাঁর *War and Peace* নামক বিখ্যাত রচনাও সহজবোধ্য নয়। এই যুক্তিতে *মেঘনাদ বধ* এর মত কাব্য কাঠিন্য দোষে দুষ্ট হয়ে সার্থক সাহিত্যকর্ম হতে পারবে না (হোসেন, ২০১৭: ৫৮)। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, মেধা, প্রজ্ঞা ইত্যাদির তারতম্য বোধগম্যতায় পার্থক্য সৃষ্টি করে তাই শিল্পের মান নির্ণায়ক হিসেবে বোধগম্যতার পার্থক্য তেমন নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। শিল্প শুধু রসের আস্বাদনই নয়, এর সাথে থাকতে হবে নৈতিকতাও এবং শিল্পের

মাধ্যমেই মানুষের অনুভূতির ঐক্য গড়ে ওঠবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন রস আস্বাদনে আস্বাদনকারীর ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন" (ঠাকুর, খণ্ড-১২, ২০১১: ৪২৬)।

৫.৫ এই জিন্দেগীর ঈদ

"এই জিন্দেগীর ঈদ" প্রবন্ধটিতে মুহম্মদ আবদুল হাই তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে ঈদকে প্রসঙ্গায়িত করেছেন। ঈদের দিন সৃষ্টি আর স্রষ্টার আনন্দের দিন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি– বাঙালী মুসলমানের ঈদকে করে তুলেছে বেদনাবিধুর আর যন্ত্রণাময় (মনিরুজ্জামান, ২০০০:২২৩)। লেখক এই প্রবন্ধে "এই জিন্দেগী" বলতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের নতুন জীবনের কথা বলেছেন। ঈদের আনন্দ আবর্তিত হয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ সব স্তরের মানুষকে খাইয়ে-পরিয়ে। একতা আর আত্মীয়তার এক উজ্জ্বল সমাবেশ- এই ছিল মুসলমানদের ঈদ উৎসব। একমাস রোজা পালনের শেষে মুসলমানদের ঘরে ঘরে মোগলাই খাওয়া-দাওয়া, নতুন পোশাক আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের হই-হুল্লোড়ে আনন্দের উষ্ণ প্রস্রবণ বইতে থাকে। ১৯৪৭ সালের রচিত এই প্রবন্ধে তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক দুরবস্থার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পুরো পৃথিবী তখন অস্থিতিশীল, তার উপর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে হিন্দুস্তানের বিশাল সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী বিনিময় ঘটেছিল। এসব রাজনৈতিক ঘটনার কারণে সমাজের সকল স্তরেই অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ১৯৪৬ সালে ঘটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও মানুষের উৎসবের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল। ওই দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, হাজার হাজার মানুষ হয়ে পড়েছিল গৃহহীন। তার উপর পাকিস্তাানি শাসক গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে এ অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করে সকল সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তাানে নিতেই তৎপর ছিল। পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ের শতকরা ষাট ভাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে হলেও ব্যয় করা হতো মাত্র ২৫ ভাগ, এছাড়াও বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কৃষি জমিতে ছিল না পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রের সরবরাহ। খাদ্য সংকট ছিল, কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ক্ষুধার্ত মানুষকে সাশ্রয় মূল্যে খাদ্য বিতরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে করে তুলেছিল অসহায়। এমনকি বরাদ্দের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শত শত বিদ্যালয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য

চরম আকার ধারণ করে। যেখানে দুমুঠো ভাতের জোগানই অনিশ্চিত, সেখানে উৎসবের রঙ ফিকে হয়ে যাবে— এটাই তো স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম এক হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের জনগণের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে কোনো সাদৃশ্যই ছিল না, ফলে দুই অংশের মানুষের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বের চেয়েও বেশি দূরত্ব ছিল মনোজগতে।

৫.৬ সুন্দরের নিমন্ত্রণ এবং সুন্দর লোকে

'সুন্দরের নিমন্ত্রণ', 'সুন্দর লোকে' প্রবন্ধ দুটিতে সৌন্দর্য সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর উপলব্ধিতে, "ব্যক্তি বিশেষে সৌন্দর্যের রুচিভেদ; কিন্তু সুন্দর জিনিস, কি সুন্দর মানুষ এ সবেরই প্রত্যেকের কাছে একটা প্রবল আকর্ষণ আছে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২২৬)। কিন্তু এ সৌন্দর্য অবলোকনে সর্বনাম 'আমরা' কিংবা 'মানুষ' দ্বারা তিনি মূলত পুরুষের সৌন্দর্য প্রীতির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা পাই বা না পাই, সুন্দরী-বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই, এমন কথা বলতে কাউকেই শুনি না। যা কিছু ভালো তারই সঙ্গে সুন্দরকে জুড়ে দেখার একটা সাধারণ নিয়ম আছে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২২৮)। তবে সুন্দরের এই অনুভূতি মোটেও স্থায়ী কিছু নয়। পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেলে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সৌন্দর্য অবলোকনে তিনি কোনো বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্তর্দৃষ্টি এবং পরিবেশ- পরিপ্রেক্ষিতের কথা বোঝানোর জন্য বলেন,

> ধরা যাক অশিক্ষিতা, অক্ষর জ্ঞানহীনা, আধুনিক সভ্যতার আলো বঞ্চিতা এক দরিদ্রা গ্রাম্য মেয়ের কথা। তার চাল চলনের অজ্ঞতা, বেশবিন্যাসের অভাব, জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা সবটা মিশিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়েছে শুধু জৈবিক প্রয়োজনের গোড়াতে; কোন রকমে জৈব জীবনের স্থূল ক্ষুধা মিটিয়ে ও দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তার আর নেই। অথচ তাকেই আজকের সভ্যতার আলো বাতাসের সংস্পর্শে আনুন, কিছুটা মার্জিত ও ভদ্র পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়ে দিন; আধুনিকা কলেজী মেয়েদের মতো কাপড় পরার ভঙ্গীটাও তাকে শিখিয়ে দিন, তা হলেই দেখা যাবে, যে ছিল আমাদের অনেকের কাছে অসুন্দর, সেই আবার অনেকের কাছে সুন্দর হয়ে চোখে পড়লো-তার বাহ্যিক রূপ আর চেহারা যেমনই হোক না কেন (আজাদ, ১৯৯৪: ২২৬)।

সুন্দরকে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি। সৌন্দর্য বিষয়টি আপেক্ষিক, এটি কোনো সর্বজনীন ধারণাও নয়, একজনের কাছে যা সুন্দর, অন্যের দৃষ্টিতে তা অসুন্দর হতে পারে। তবে 'সুন্দর' বলতে নরনারীর সৌন্দর্যের কথাই পরস্পরের মনে বেশী করে গুঞ্জরিত হয় (আজাদ, ১৯৯৪: ২২৭)। তাঁর প্রবন্ধে সৌন্দর্য বন্দনা সীমিত আকারে হলেও নায়ক প্রসঙ্গে তিনি পুরুষের জন্যও সাজ প্রয়োজন বলে মনে করেন । সুন্দরকে উপলব্ধি করতে হলে, সুন্দরলোকের নিমন্ত্রন পেতে হলে অন্তর্গত রসদৃষ্টি একান্তভাবে

প্রয়োজন। “... রসিকচিত্তের কাছে সেই সুন্দর ধরা দেয়; তখনই সেই রসিক চিত্ত প্রাণ খুলে বলতে পারে-“অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে” (আজাদ, ১৯৯৪: ২২৭)। প্রবন্ধের শেষাংশে যেন মোহমুক্তি ঘটে, প্রাবন্ধিক সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেন অন্য এক মাত্রায়, অন্য এক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই তিনি গেয়ে ওঠেন, ‘এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর/ ধন্য হলো অঙ্গ মম পুণ্য হলো অন্তর’ (আজাদ, ১৯৯৪: ২৩২)। ‘সৌন্দর্য’ নান্দনিকতার কেন্দ্রীয় ধারণা। ‘নন্দনতত্ত্ব’ দর্শনের একটি প্রাচীন শাখা যেখানে সৌন্দর্য, শিল্প, সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও উপভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষের সংবেদনশীলতা ও আবেগের মূল্য এবং অনুভূতি ও স্বাদের বিচারও নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয। ‘নন্দন’ শব্দের অর্থ যা থেকে আনন্দ পাওয়াা যায়, সুতরাং অনুভূতির প্রকাশভঙ্গীর নামই নান্দনিকতা আর এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সৌন্দর্য। সৌন্দর্য তথা নান্দনিকতা সম্পর্কে সকল দার্শনিক এবং বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা আলোচনা করেছেন। নান্দনিকতার কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাপক নেই, ব্যক্তির রুচি,অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, বিচার এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও মাত্রা পরিগ্রহ করে। এটি একটি সুগভীর চেতনা, এর সাথে সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। তবে নান্দনিকতা সর্বজনীন বিশ্ববোধে রূপান্তরিত হতে পারে। সৌন্দর্যবোধ আপেক্ষিক, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। সৌন্দর্য অনির্দিষ্ট এবং অসংজ্ঞায়িত। কনফুসিয়াস-এর মতে,“ সৌন্দর্য মানুষের উপলব্ধির সাথে সম্পর্কিত। জগতে সর্বত্রই সৌন্দর্য আছে, তবে দেখার ভিন্নতার কারণে সকলের নিকট তা সমানভাবে ধরা পড়ে না” (হোসেন, ২০১৭: ৩০)। মানুষের জগৎবীক্ষা ঘটে সৌন্দর্যের উপলব্ধি দ্বারাই, ‘আমি’ কবিতায় বলেছেন, “আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে−/ জ্বলে উঠলো আলো−/ পুবে পশ্চিমে−/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম− ‘সুন্দর’/ সুন্দর হলো সে” (ঠাকুর, ২০১৪: ৪৬৮)। সৌন্দর্যের সাথে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, শিল্প হচ্ছে আবেগকে তীব্রতর করার একটা পন্থা, ভাব ও প্রতিক্রিয়াকে ‘প্রচন্ড’ রূপ দেয়ার হাতিয়াার। প্রেমিকার সৌন্দর্যমুগ্ধ প্রেমিক যখন সহজ ভাষায় সে সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে কবিতা রচনা করে কিংবা ছবি আঁকে তখনই তা শিল্পে রূপ নেয়। প্লেটো সুন্দরকে স্বর্গীয় ধারণার (divine idea) সাথে সম্পর্কিত করেছেন, যা স্বর্গীয় ধারণার সাথে সম্পর্কিত নয় তা সুন্দর নয়। তিনি তার ভাববাদী দর্শনে কল্যাণের ধারণা (idea of good)-কে “পরম সুন্দর” (absolute beauty) এবং “পরম সত্য” (absolute truth) -এর সাথে একাত্ম করেছেন (হোসেন, ২০১৭: ৫৫)। রাস্কিন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মহত্ব ও শুচিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যে কোনো বাহ্যিক বিষয় যখন চিন্তা ছাড়াই কেবল বাহ্যগুণে আনন্দ উৎপাদন করে তখন সেটাই হয়ে যায় সুন্দর, কেন তা সুন্দর, এর পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় না। অনেকে আবার সত্যকেই সুন্দর বলে মেনে নিয়েছেন। বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন কিটস বলেছেন, "Beauty is truth, truth

beauty, --that is all / ye know on earth, and all ye need to know" (নন্দী, ২০২০: ৫৩)

৫.৭ মহাভয় মহৎগুণ

"মহাভয় মহৎগুণ" প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মৃত্যু ও মৃত্যুভয় বিষয়ক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। মহৎগুণ মহাভয়, অর্থাৎ 'প্রয়াণ অবশ্যম্ভাবী' অথবা 'বিদায় অনিবার্য' হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা জীবন ও মৃত্যু– এ দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারেন তাঁরাই হয়ে ওঠেন মহত্তম। আমাদের সমাজে খুব ছোটোবেলা থেকেই শিশুদের ঘুম পাড়ানো থেকে ভাত খাওয়ানো– দৈনন্দিন জীবনাচারের বিভিন্ন কাজ ভয় দেখিয়ে করানো হয়ে থাকে, এই অহেতুক ভয় তাকে সারা জীবনই তাড়া করে ফেরে। লেখক মনে করেন মৃত্যুভয়ই কেবল পারে মানুষকে নানান অনাচার, অবিচার এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ থেকে বিরত রাখতে। আবার অতিরিক্ত মৃত্যুভয় মানুষকে জীবনের প্রতি অনাগ্রহী করে তুলতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, এক্ষেত্রে ধর্মই দুয়ের মাঝে মেলবন্ধন তৈরি করতে সক্ষম। পরিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করেও অন্তরে যে ধারণ করবে মুত্যুর মহাভয়, সে-ই হয়ে ওঠে মহত্তম। তিনি প্রত্যাশা করেন, "এই গুণটি বেঁচে থাক সকলের মধ্যে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৩৬)। 'মৃত্যু' মানব জীবনের অমোঘ সত্য অনিবার্য ঘটনা, এ নিয়ে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তাই কবি-সাহিত্যিকদের রচনাও মৃত্যু-চিন্তা প্রায়শই দেখা যায়। রবীদ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, উপন্যাস, কবিতায় নানাভাবে মৃত্যু-চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, "ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়/ মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।/ তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তব বক্ষে কোলে/ জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে" (ঠাকুর, খণ্ড–৩, ২০১১: ৭০)। আবার 'মরণ' কবিতায় মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই তাকে পরম জন হিসাবে আহ্বান করেন, "মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান/ মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জট/ রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট/ তাপবিমোচন করুণ কোর তব/ মৃত্যু অমৃত করে দান" (ঠাকুর, খণ্ড–৩, ২০১১: ১৫২)।

৫.৮ কৈফিয়ত

'কৈফিয়ত' প্রবন্ধে বাংলাদেশের মানুষের শ্রমবিমুখতা, এর কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে যে বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও বর্তমান বাংলাদেশে সেই অবস্থাই প্রকটভাবে বিরাজ করছে। তিনি যথার্থই বলেছেন, "...যারা স্বভাবে হীন, জ্ঞানের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ, অলস, নীচতা ও নিষ্ঠুরতায়পূর্ণ, জাতি হিসেবে তারা মৃত" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৪০)। এ প্রসঙ্গে তিনি পদার্থবিদ্যার সূত্রের কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত *প্রাকৃতিক দর্শনের গাণিতিক মূলনীতি সমূহ* গ্রন্থে পদার্থবিদ্যার গতি বিষয়ে তিনটি সূত্র উপস্থাপন করেন, বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি সূত্রের প্রথমটি হল- "বাইরে থেকে বল প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সরল পথে

গতিশীল থাকবে”– এই সূত্রটিকে ইংরেজিতে বলা হয ‘ল অফ ইনারশিয়া’। মুহম্মদ আবদুল হাই কৈফিয়ত প্রবন্ধে অলস ব্যক্তি ও জাতিকে কর্মচঞ্চল করে তোলার জন্য বিজ্ঞানের এই সূত্র প্রয়োগের একটি সার্থক পটভূমি রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালি স্বভাবতই মন্থর জাতি, আবদুল হাই এই মন্থরতার জন্য প্রথমত দায়ী করেছেন এদেশের প্রকৃতিকে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলিমাটির স্তর জমে জমে সৃষ্ট এই ভূখণ্ড অতি উর্বর হওয়ার কারণে এখানে অল্প পরিশ্রমে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব অথচ পৃথিবীতে অনেক স্থান রয়েছে যেখানে ভীষণ পরিশ্রম করে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে হয়। এ কারণে এসব অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন শক্ত-পোক্ত হয়ে থাকে, অপরদিকে সহজে জীবিকা অর্জনে সক্ষম বাঙালির দেহের গঠন যেমন বলিষ্ঠ নয়, তেমনি তারা কোমল মনের। দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাসের কারণেও এ জাতি আলস্য-প্রিয়। পান্তা ভাতের মাদকতায় তারা বুঁদ হয়ে অলস সময় পার করতে ভালোবাসে। পান্ত ভাত গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়, তাই এ ভাত খাওয়ার পর কৃষক যেমন মাঠে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি শুয়ে বসে ঝিমানোটাও বেশ আরামদায়ক। শর্করা জাতীয় খাবার মানুষকে অলস করে তুলতে পারে। রান্না করা ভাত ১০/১২ ঘণ্টা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখার ফলে গাজনকারী অনুজীবের ক্রিয়াশীলতায় শর্করা ভেঙ্গে ইথানল ও ল্যাক্টিক এসিড তৈরি করে। অনেক বেশি সময় ধরে ভিজিয়ে রাখার ফলে তাতে অ্যালকোহলের উপাদান তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী এভাবে অ্যালকোহল তৈরি করে যা ‘তাড়ি’ নামে পরিচিত। হাজার বছর ধরে বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে বলেন, “...প্রাচীন বাঙলার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাংলার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান” (রায়, ২০১৩: পৃ. ১৬৫)। হাজার বছরের পুরানো চর্যাপদের বিভিন্ন পদে ভাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন–“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।/ হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেশী।” আবদুল হাই মনে করেন, ভাত ও পান্তাা ভাত খেয়ে অলস বাঙালির শয়তানের কারখানা হয়ে ওঠা অলস মস্তিষ্কপ্রসূত উৎকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনার ফল হিসাবে তারা সংস্কৃতমনা হয়ে ওঠে, তাই তিনি এ জাতিকে ‘মোস্ট পয়েটিক রেস ইন দা ওয়াার্ল্ড’ বলে অভিহিত করেছেন। অলসতার কারণে শঠতা বা ধূর্ততার প্রবৃত্তিও তাদের মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের ও সুস্থ মনের অধিকারী ব্যক্তিরাও অলস সময় কাটাতে পছন্দ করে। লেখক এসব মানুষের 'স্থিতিজড়তা’ তথা আলস্য কাটিয়ে র্কমপ্রবণ করে তোলার জন্য নিউটনের সূত্রানুযায়ী বাইরের বল প্রয়োগ করার কথা বলেছেন, যা হতে পারে অনুপ্রেরণা, প্রেষণা, তিরস্কার বা পুরষ্কার। এই প্রবন্ধে মূলত মুহম্মদ আবদুল হাই নতুন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাময় মাহেন্দ্রক্ষণে জাতিকে কর্ম-চঞ্চল করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

৫.৯ সাহিত্যিকের জবানবন্দী এবং সাহিত্যের নীরব সাধক

'সাহিত্যিকের জবানবন্দী' এবং 'সাহিত্যের নীরব সাধক' এই দুইটি প্রবন্ধে সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষদের অব্যক্ত অনুভূতিগুলোর দুঃসহ যন্ত্রণাকে চিত্রায়িত করেছেন অসাধরণ রচনার মধ্য দিয়ে। জগতের নানা ঘটনা প্রবাহ সংবেদনশীল মানুষের মনে অব্যক্ত অনুভূতি অনুরণন রূপে ধ্বনিত হতে থাকে। রূপ- রস-গন্ধ-বর্ণ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি সংবেদনশীল বিষয়াদি প্রভাবক রূপে সেইসব মানুষকে উদ্বেলিত করে, তাদের অস্থির অন্তর্জগতকে মথিত করে বিচিত্র অনুভূতিতে সিক্ত ও বর্ণিল হয়ে কল্পনা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে শ্রুতিমধুর হৃদয়গ্রাহী কথামালা রূপে প্রকাশিত হয়ে সাধারণ মানুষের চিত্তকে মোহিত করে এবং ঐ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন একজন কবি। 'বড় দুঃখে' ও 'সুগভীর আনন্দে' কবিরা একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন। হৃদয়ের ঘনীভূত ব্যথা আর অপরিসীম আনন্দ কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। সংবেদনশীল এই কবিদের সাথে মোহাম্মদ আবদুল হাই নারীদের তুলনা করেছেন। সংবেদনশীল নারীর দুঃখ-কষ্টের অভিব্যক্তি অশ্রুমালা হয়ে ঝরে পড়ে আর কবিদের সংবেদনশীলতা কথামালা রূপে মানুষের মনে শিল্প-রসের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। আবদুল হাই মনে করেন হৃদয়ের গভীর ও বিচিত্র অনুভূতি যা মানুষকে বিষণ্ন, ব্যথিত বা সুগভীর আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা প্রকাশ হওয়া উচিত, হোক তা অশ্রুধারায় অথবা কাব্যধারায়। এক্ষেত্রে "নিরব কাব্য কাব্য নহে, নীরব কবিও তথৈবচ; অতএব প্রকাশ চাই" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৪০)। অস্তিত্বহীন অনুভূতি প্রকাশ অবাচনিক হতে পারে, তবে তা সমাজ সংসারে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ। এমন ধারার "নীরব কবি"কে সাধকের মর্যাদা দিতে মুহাম্মদ আবদুল হাই মোটেও কুণ্ঠিত নন।

৫.১০ ওস্তাদজী

'ওস্তাদজী' একটি ছোটো গল্প, যা রচিত হয়েছে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গল্সওয়ার্দীর "Ultima Thule" গল্পের ছায়া অবলম্বনে। গল্পটি মূলত মানুষের সাথে তুচ্ছ প্রাণীর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। আবদুল হাইয়ের ছোটো গল্প প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েন উল্লেখ করেন "তিনি গল্প লেখার প্রতি যদি নিষ্ঠাবান হতেন তাহলে বোধ হয় খ্যাতিমান হতে পারতেন" (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ৩৩০)। গল্প পাঠে এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হয়। অত্যন্ত মানবিক ও করুণরসে সিক্ত গল্পটি যে কারো হৃদয়কে উদ্বেলিত করবে। নির্লোভ, নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ শিল্পীর জীবন আবর্তিত ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে আর্ত পশু-পাখির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে। মানব মনের অতলান্তের জটিল অলিগলি থেকে উৎসারিত ভালোবাসার ফল্গুধারা ভাসিয়ে নিয়েছে মানুষ থেকে শুরু করে মানবেতর প্রাণিগুলোকেও। অবোধ প্রাণীগুলোও অকাতরে বিলিয়েছে ভালোবাসা, বয়োবৃদ্ধ শিল্পীর জীবনকে করে তুলেছে তাৎপর্যপূর্ণ। অকাতরে তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি মমত্ব আর ভালোবাসা ছড়ানোই নয়, মানবীয় সম্পর্কের অন্ধিসন্ধির ভিন্নমাত্রাও পাঠককে হতবিহ্বল করে তোলে। এ গল্পের করুণ রেশটুকু

পাঠকের মনে দীর্ঘকাল রয়ে যায়। বৃদ্ধের মৃত্যুতে তাঁর পোষা তোতাপাখিটির জীবনাবসানের করুণ ঘটনা পাঠককে করে তুলে বেদনার্ত, পাঠক মানস চোখে যেনো স্পষ্ট দেখতে পায় "... শিল্পী বন্ধুর বুকের উপরেই সেই পাখিটা মরে রয়েছে- নিস্পন্দ, নিঃসাড়" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৫৪)। গল্পে অসহায় বৃদ্ধের ততোধিক অসহায় প্রাণীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাঠকের মনকে আদ্র করে তুলে। আবার পুরো গল্পে খল হিসাবে উপস্থাপিত গৃহকর্ত্রীর নিদারুণ মনোবেদনার বহিপ্রকাশ এক ঝটকায় পাঠকের কাছে তার দুর্বলতাকে উম্মোচন করে দেয়। সবিস্ময়ে পাঠক আবিষ্কার করে, এই নারীর প্রতিদিনের বেঁচে থাকা আবর্তিত হয়েছে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধকেই কেন্দ্র করে! বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যের সব ধারায় পশু-পাখিসহ অন্যান্য প্রাণীর উজ্জ্বল উপস্থিতি ও তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ পশু-পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে উপজীব্য করে হৃদয়স্পর্শী অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। গরু, ছাগল, মোষ, ঘোড়া, হাতি কুকুর, বিড়াল, হাঁস, শালিক– কী নেই এ তালিকায়? আবার জোঁক, পিঁপড়া, তেলাপোকাসহ অনেক পোকামাকড়ের অস্তিত্বও বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। কবি জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুর পর শঙ্খচিল, শালিক, কাক, হাঁস, বক ইত্যাদি নানা ধরনের পাখি হয়ে এই বাংলায় আবার ফিরে আসার তীব্র অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন (দাশ, ২০২৪: ১২১)। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কালজয়ী গল্প 'মহেশ'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি গরু। মানব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে– দর্শন থেকে ধর্মগ্রন্থ, রূপকথা, লোককথা, উপকথা এমন কী অপকথা (গালাগালি)– সর্বত্রই পশুপাখির উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়।

৫.১১ বেসুর

রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জীবনের সুর কেটে বেসুর করে তোলে, সেটাই উঠে এসেছে 'বেসুর' গল্পটিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বেসুর' কবিতায় লিখেছেন, "ভাগ্য তাহার ভুল করেছে –প্রাণের তানপুরার/ গানের সাথে মিল হল না, বেসুরো ঝংকার" (ঠাকুর, খণ্ড-৯, ২০১১: ২৭) সুর কেটে যাওয়া কোন গান বা কবিতা যেমন শুনতে আর ভালো লাগে না বরং বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ছন্দবদ্ধ জীবনে অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা জীবনের ছন্দপতন ঘটাতে পারে। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সামাজিক-সাংস্কৃতি-রাজনৈতিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা আর বেদনা সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, সুস্থির ও রঙ্গিন জীবনের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অসমবয়সী দুজন নর-নারী পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও অনাকাঙ্ক্ষিত এক রাজনৈতিক ঘটনার কারণে প্রচন্ড আক্রোশ আর তীব্র ঘৃণায় পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটি বিষণ্ন গল্প ' বেসুর'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত গল্পটি ১৯৪৭ সালের মাসিক মোহাম্মদী

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তুচ্ছ একটি কারণে ১৯৪১ সালে সংঘটিত হয় ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা ইতিহাসে 'ঢাকা দাঙ্গা' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের শাঁখারী বাজারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হোলি উৎসব চলাকালে এক মুসলিম নারীর গায়ে রঙ মেশানো পানি পড়লে সামান্য বাক-বিতণ্ডা ঘটে, যার জের ধরে ১৮ই মার্চ একজন বালকসহ তিনজন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা প্রবল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ভয়াবহ দাঙ্গায় রূপ নেয় (ইসলাম, খণ্ড-৪, ২০০৩: ২০৪)। দেশ বিভাগের নির্মমতা এবং “সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা” বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ে খাজা আহমেদ আব্বাসের 'ছুরি' গল্পটি বেশ বিখ্যাত। তবে দাঙ্গা বিষয়ক ও নামক প্রথম গল্পের লেখক সোমেন চন্দ। এছাড়া পরবর্তী সময়ে হাসান হাফিজুর রহমান, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুসহ আরও অনেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করেছেন। শত শত বছর একসাথে বাস করা মানুষগুলো রাতারাতি হিংস্র দানবের পরিণত হয়ে কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে প্রিয় বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী অথবা অচেনা যে কাউকে– এই বীভৎসতা যে কোনো সংবেদনশীল মানুষকে বিচলিত করে। দাঙ্গার ফলে শুধু মানুষেরই মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যু ঘটে সুন্দর মানবীয় সম্পর্কগুলোরও। ভালোবাসাময় মুল্যবান সর্ম্পক রাতারাতি ঘৃণায় পাল্টে যাওয়া– যে কোনো সংবেদনশীল মানুষকে ব্যথিত করে তোলে।

৫.১২ ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর

“ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর” গল্পে যেমন উঠে এসেছে নারী পুরুষের প্রেম আর আত্মত্যাগের কথা তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে নারী-লিপ্সু বর্বর পুরুষের চরম নিষ্ঠুরতা, যার শেষ পরিণতি ঘটে নিষ্পাপ ভেলুয়া ও তার প্রেমময় স্বামী মদনের জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে। এ গল্পের খলনায়ক হওয়া সত্ত্বেও আবু সওদাগরের শক্তিশালী উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। “ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর” গল্পটি চট্টগ্রামের লোককাহিনী নির্ভর পালাগান “ভেলুয়ার সুন্দরী” অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এই কাহিনি নিয়ে একাধিক পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। আবদুল হাই রচিত গল্পের সাথে পালা গানের কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। মূল কাহিনিতে ‘আমির সওদাগর’ নায়ক কিন্তু আবদুল হাই রচিত গল্পের নায়ক ‘মদন’। তবে নায়িকা ভেলুয়া অত্যন্ত রূপবতী এক বণিক কন্যা– এ বিষয়ে কোনো মতভেদ পাওয়াা যায় না। মুন্সি মোয়াজ্জম আলী রচিত পুঁথিতে ভেলুয়ার রূপের মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় নিম্নরূপ–

“আকাশের চন্দ্র যেন রে ভেলুয়া সুন্দরী
দূর থেকে লাগে যেন ইন্দ্রকুপের পরি
আর সুন্দর লাগে রে ভেলুয়ার চোখের ভঙ্গিমা
আঁখির ওপর ভুবু কন্যার অতি মনোহর।” (আলী, ১৯৪৫: ৬)

আবদুল হাইয়ের গল্পে ভেলুয়ার প্রেমে পড়ে মদন নামক এক বনিক। সে ভেলুয়াাকে বিয়ে করতে চাইলেও ভেলুয়ার পরিবার তাকে প্রত্যাখ্যান করে । কিন্তু ভেলুয়া আর মদন পালিয়ে বিয়ে করে মদনের দেশে চলে এলেও নানা ঘটনা তাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। গল্পের শেষে দেখা যায়, প্রবল ঝড়ে মধ্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেলুয়া এবং মদন- দুজনেরই মৃত্যু ঘটে। পুরুষের লিপ্সা আর নিষ্ঠুরতার কাছে নারীর অসহায়ত্ব গল্পকে করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত করেছে। বিভিন্ন পুঁথিতে চরিত্র এবং ঘটনার পরম্পরায় পার্থক্য থাকলেও অনেকেই ভেলুয়া সুন্দরীর এই কাহিনিকে সত্য বলে মনে করেন, কারণ চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলীতে টলটলে জলের বিশাল ভেলুয়ার দীঘির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে।

৫.১৩ তিস্তা এবং সুরমা

'তিস্তা', 'সুরমা' এ দুটি নদীর আত্মকাহিনী রচনাশৈলীতে অনোন্যসাধারণ, বর্ণনা যেন নদীর মত কলকলিয়ে বয়ে চলা কথাকাব্য। এ প্রবন্ধে নদীদুটোর সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি লেখক রূঢ় বাস্তব কিছু বিষয়ও তুলে ধরেছেন। রূপমুগ্ধ কবি সাহিত্যিকদের রচনায় কেবল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা নদীর স্তুতি, তাই তিস্তার কণ্ঠে অপ্রাপ্তির বেদনা! এ প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজের শিক্ষিত মানুষদের আত্মপ্রশংসা-প্রচারণারত নির্লজ্জ দিকটি উৎকীর্ণ হয়েছে। 'সুরমা' নদীর মনোহর রূপ ও গতিগথ বর্ণনার সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে নদীর ভূমিকার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই রচনাদুটোতে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং সচেতনতা ও ফুটে ওঠেছে। বাঙালির জীবনের সাথে নদীর ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার কারণেই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এর প্রবল উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। নদীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য গল্প, কবিতা, গান, উপন্যাস রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বাংলা ভাষার বিখ্যাত এবং অখ্যাত সকল কবি নদীকে উপজীব্য করে তাঁদের কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রেম ও প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ 'নদী' নামক একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। একটি কবিতায় তিনি নদীকে নিজ আত্মজার সাথে তুলনা করেছেন, "... নদী, তুমি কোন্ কথা কও?/ তুমি যেন ছোট মেয়ে–আমার সে ছোট মেয়েঃ / যত দূর যাই আমি– হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,/ তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমিঃ আমারই নিজের শিশু সারাদিন/ নিজ মনে কথা কয়।" (দাশ, ২০২৪ঃ ৪৫৮) রবীন্দ্র-সাহিত্যে নদীর প্রভাব অপরিসীম। বাংলার প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-সুধা অবলোকন করার জন্য নদীতে ভ্রমণকারী লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। তিনি জমিদারি দেখাশোনার জন্য শিলাইদহে বোটেই ভেসে বেড়াতেন। এসময় তিনি 'নৌকাডুবি'সহ বাংলা সাহিত্যে মণিমানিক্য তুল্য অনেক ছোট গল্প রচনা করেছেন। এছাড়াও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *পদ্মা নদীর মাঝি*, অদ্বৈতমল্লবর্মন *তিতাস একটি নদীর নাম*, সমরেশ বসুর *গঙ্গা* প্রভৃতি সাহিত্য নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। গাঙ্গেয় ভূমি এই বাংলার

জনজীবনে নদী কেবল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। হাজার বছর ধরে নদীর সাথে এ অঞ্চলের মানুষের গভীর সম্পর্ক। মানব সভ্যতার বিকাশেও নদীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষার স্বার্থে নদীকে দূষণমুক্ত এবং ক্ষতিকর বাঁধ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে । বর্তমান বিশ্বে নদী-ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী একটি বিদ্যা। একটি দেশের অর্থনীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক নদী বেদখল হয়ে গেছে, নাব্যতা হারিয়েছে এবং দূষিত হয়ে পড়েছে, ফলে মাছ ও জলজ প্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। আবার অল্প বৃষ্টিতেই ফসল ও বাড়িঘর পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। মুহম্মদ আবদুল হাই তিস্তা ও সুরমা–এই দুটি প্রবন্ধে আত্মকাহিনি বর্ণনার ছলে উৎপত্তি, গতিপথ, সৌন্দর্য এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকার পাশাপাশি মানুষের জীবনে এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিকটিও তুলে ধরেছেন। ভূ-রাজনীতি এবং দূষণ, দখল, ক্ষতিকর বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়সহ নদী-নির্ভর জীবিকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদীর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে নদীর পানির প্রবাহ ঠিক রাখা, দূষণমুক্ত রাখা ও দখল রোধে জড়িত আছে ২৭ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ । (রহমান, ১৮ই মার্চ, ২০২৪)

৬.১৪ শিলিং-এ মে মাস

'শিলিং-এ মে মাস' অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় রচিত এক ভ্রমণকাহিনি যা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সাহিত্য প্রতিভায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এ প্রবন্ধে বর্ণিত শিলং-এর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাঠকের মনে ভ্রমণ-তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। ধারণা করা যায়, লেখকের অল্প বয়সে রচিত এই ভ্রমণ কাহিনীর পরিণত রূপ *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন।* বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগের তাড়ণা মানুষকে ভ্রমণ-পিপাসু করে তোলে। তবে ইতিহাস অনুসন্ধান, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন- এসব ভিন্ন ভিন্ন কারণেও মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভ্রমণ করে থাকে। তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দকে ধরে রাখতে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করে ভ্রমণকাহিনি, একটি সার্থক ভ্রমণকাহিনি স্থান-কাল অতিক্রম করে পাঠককেও করে তোলে ভ্রমণ-সঙ্গী। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দেড়শত বছরের পুরানো। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করলে তা হয়ে ওঠে অমূল্য সাহিত্য। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে মনে করা হয় দুর্গাচরণ রায় রচিত '*দেবগণের মর্ত্তে আগমন*' যা ১৮৮০ সালে *কল্পদ্রুম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনি, যেখানে স্বর্গের দেবতাদের মর্তে আসার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে (চৌধুরী, ২০২৩: ৬৫৫)। তবে একই সালে *বঙ্গ দর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত *পালামৌ*, যা বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক ভ্রমণকাহিনি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যকে

নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর নানা জায়গা তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, তবুও তাঁর আকুতি ছিলো ভ্রমণের, মৃত্যুর পূর্বে অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ 'ঐকতান' কবিতায় লিখেছেন- 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি/ দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী-/ মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু/ রয়ে গেল অগোচরে। *জাভা যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র* তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ সাহিত্য। এই শ্রেণির সাহিত্য তালিকায় আরও যাঁদের রচনা সংযোজিত হয়েছে তাঁরা হলেন, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। 'শিলিং-এ মে মাস' ভ্রমণ কাহিনিটি সাধু ভাষায় রচিত হলেও নৈসর্গিক সৌন্দর্য বর্ণনা তাতে মোটেও বাধাগ্রস্ত হয়নি। ঝর্ণা, পাহাড় আর সবুজের সমারোহ, যে কোনো পর্যটককে বিমোহিত করে। লেখক এই প্রবন্ধে শিলং এর প্রকৃতির সাথে সাথে এ অঞ্চলের খাসিয়া জনগোষ্ঠির আচার-আচরণ, ধর্মীয় উৎসব, পোষাক, জীবনযাত্রা প্রভৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি একটি বাজারের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে অধিকাংশ বিক্রেতাই খাসিয়া নারী। খাসিয়া জনগোষ্ঠীর শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ নারী। পুরুষের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি তারা অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বেশি হলেও কিছু কিছু হিন্দু ও মুসলমানও দেখা য়ায়। খাসিয়াদের বাৎসরিক জাতীয় নৃত্য উৎসব আড়ম্বরপূর্ণ হলেও অনুষ্ঠানের কোনো ছবি তোলা নিষিদ্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক শিলংয়ের মনমোহিনী ঈগল ফল্‌স্‌ এর চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি ঝর্ণাকে 'জননী মৃত্তিকা দেবী রোরুদ্যমনা' বলে অভিহিত করেছেন। অফুরান নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পসার সাজিয়ে ঝর্ণার হিল্লোল দোলে লেখকের কবি মন গেয়ে ওঠে, "ঝর্ণা তোমার স্ফটিক জলের/ স্বচ্ছ ধারা।/তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে /সূর্যতারা" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৭৮) শিলং -এর অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অত্যাধিক বৃষ্টিপাত যা মানুষকে কখনও কখনও বিষণ্ন করে তোলে।

৫.১৫ কথা শেখা

মানব ভাষা-আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল একটি বিষয়। 'কথা শেখা' প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই, যারা কথা বলতে পারে না তাদের জন্য স্পিচ থেরাপির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বর্ণনা করেছেন। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানে শিক্ষিত মুহম্মদ আবদুল হাই এই প্রবন্ধে উচ্চারণক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ভাষার সঠিক উচ্চারণ আয়ত্তে আনার জন্য শৈশবকাল থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। ইংল্যান্ডের স্কুল শিক্ষকদের ধ্বনিবিজ্ঞানীর সাহায্যে সঠিক উচ্চারণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেন তারা শিশুদের প্রথম থেকেই যথাযথভাবে প্রমিত উচ্চারণ শেখাতে পারেন। ভাষাবৈকল্যের চিকিৎসায় ধ্বনিবিজ্ঞানীদের যে অবদান রয়েছে তা উঠে এসেছে এ প্রবন্ধে। তিনি যথার্থই বলেছেন "... ধ্বনি সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবন রচনার বড় কাজে লাগে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৮৭)। ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক এই বিষয়টি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আধুনিক

ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চারণ শিক্ষা ও ভাষাকৈল্যের চিকিৎসায় ধ্বনিবিজ্ঞানীদের গুরুত্ব সর্বাধিক। সঠিক উচ্চারণে কথা বলতে শেখানো এবং বৈকল্য দূর করার জন্য পিতামাতাও অবদান রাখতে পারেন "... ব্যায়াম করে প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণগত যে কোনো দোষই নিখুঁতভাবে সারিয়ে নেওয়া যায় এবং উচ্চারণের উন্নতি করে ব্যক্তিত্বেরও মর্যদা বাড়িয়ে তোলা যায়" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৮৬)। ভাষার প্রমিত উচ্চারণ শেখা, ভাষাবৈকল্য প্রভৃতি প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর অবতারণা ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইকে অনন্যতা দান করেছে।

৫.১৬ ভাষার কথা

'ভাষার কথা' প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা নামক সামাজিক প্রপঞ্চ (social phenomenon)-এর পরিচয় সাবলীল ও সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে ভাষার ভূমিকা ও সংগঠন– উভয় দিকেরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং কণ্ঠস্বর বা intonation-এর কারণে অর্থ পার্থক্য থেকে শুরু করে ভাষার লিখিতরূপ, অর্থ-বিপর্যয়, বর্ণের পরিবর্তন এবং শিশুর ভাষা শেখা– ভাষাবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়াদির সুন্দর,সহজ ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ঘটেছে। প্রবন্ধটি ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব-কথা ঠাসা উচ্চমার্গীয় কোনো উপস্থাপন নয়, বরং সহজ-সরলভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষাবিজ্ঞানের সরলীকৃত পাঠ, যা নিঃসন্দেহে মানুষকে ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

৫.১৭ ভাষা ও ব্যক্তিত্ব

সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি বিষয় "ভাষা ও পরিচয়" (Language and Identity), আধুনিক এ বিষয়টি মুহম্মদ আবদুল হাই শনাক্ত করেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি "ভাষা ও ব্যক্তিত্ব"– এই প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধে তিনি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাহন হিসাবে মানব ভাষার ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে বলেন, "...সমাজ জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রকাশক তার মুখের কথা। সামাজিকতার সবচেয়ে বড় উপাদান, এমন কি একমাত্র উপাদান পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় এবং এ ভাব বিনিময় মানুষ করতে পারে ভাষারই মাধ্যমে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৯৫)। তিনি আরো বলেন, "কথাই যে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সবচেয়ে বড় উপাদান তার আরও দৃষ্টান্ত আমরা পাবো যাকে চিনিনে বা জানিনে তার কথা শুনে" (আজাদ, ১৯৯৪: ২৯৬)। কথা বা ভাষার ব্যবহার আকস্মিক কোনো বিষয় নয়, একটি মানব শিশু যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও সংসর্গ-সাহচর্য লাভ করে, সর্বোপরি রুচিবোধ তার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। একজন মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে কথা বলে, ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, রুচি, বংশ পরিচয় প্রকাশ পায় (আজাদ, ১৯৯৪: ২৯৭)। ভাষা মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক ও বাহক। মূলত ভাষাকে ভিত্তি করে একটি সম্প্রদায়ের

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। একথা আজ অনস্বীকার্য, একটি জাতির অহংকার ও পরিচয় হলো তার ভাষা। প্রকৃতপক্ষে ভাষার সাথে জাতীয়তাবোধের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে জাতীয়তাবোধ কোন স্থির ধারণা নয়, সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হতে পারে। এই বোধটি আবার ভাষা ও অন্যান্য সামাজিক প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। একটি জাতির ভাষা তার জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা একই সাথে তার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একটি জাতির ভাষার প্রতি মনোভঙ্গি ভাষা–আনুগত্যকে সমানুপাতিকহারে নির্ধারণ করে। মনোভঙ্গি যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে ভাষা-আনুগত্যও বেশি থাকবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রপঞ্চ, কারণ মনোভঙ্গির নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে একটি ভাষা বিপন্ন হতে পারে, তার কার্যভার কমতে কমতে এক সময় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। ভাষার প্রতি মনোভঙ্গির তারতম্য মূলত সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক কারণে ঘটে থাকে। উচ্চমাত্রার ইতিবাচক মনোভঙ্গি ভাষা আনুগত্যকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যে, ভাষাভাষী ওই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে পারে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি নিজের জীবন দিয়েছিল, যা ভাষার প্রতি সর্বোচ্চ ইতিবাচকতা এবং আনুগত্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ভাষা আনুগত্যের মাত্রা ব্যক্তির পরিচয়কে প্রভাবিত করে। ভাষা-মনোভঙ্গি, ভাষা-আনুগত্য এবং পরিচয় এই তিনটি বিষয় পরস্পর কেবল গভীরভাবে সম্পর্কযুক্তই নয়, একটি অন্যটির প্রভাবক হিসেবে কাজ করে মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

৫.১৮ সুভাষণ

ইতিবাচকতাই মানুষের সহজাত প্রবণতা, তাই এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ভাষার মধ্যে। সামাজিক মানুষ সরাসরি খারাপ বা নেতিবাচক বা অস্বস্তিকর কোনো কথা উচ্চারণ করে অন্যের আবেগ-অনুভূতিকে আহত করতে চায় না, তাই মন্দটাকেও সুশোভিত করে, সুভাষিত করে। 'সুভাষণ' প্রবন্ধটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "আপাতত অভদ্র জিনিসগুলোর ভদ্র প্রকাশের সাধারণ নাম দেওয়া যায় 'ভদ্রভাষা'। ভাষাতত্ত্ব মতে এগুলোর পারিভাষিক নাম সুভাষণ (euphemism)"(আজাদ, ১৯৯৪:৩০০)। প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণ দিয়ে ইউরোপীয় সমাজে সুভাষণের চমকপ্রদ সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সুভাষনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, প্রকৃতির ডাকে তাড়িত একজন নিগ্রো হন্তদন্ত হয়ে মুহম্মদ আব্দুল হাইকে জিজ্ঞেস করল "Have you seen a gentleman?" তিনি প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও ঐ ব্যক্তির ভাবসাব দেখে অনুমান করলেন প্রকৃতির ডাকে ভার-লাঘবের নিমিত্তে পথে, ঘাটে, স্টেশনে ছড়িয়ে থাকা 'মবহঃষবসধহ'-কেই খুঁজছে। বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ক অনেক সুভাষিত শব্দ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অপভাষা (slang words) নিয়েও আলোকপাত করেছেন, যেগুলো তাঁর ভাষায় "আপাংতেয় শব্দ"। ভাষাকে সুভাষিত করতে কণ্ঠস্বর

বা intonation- এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন- "একই কথা কণ্ঠস্বরের ব্যতিক্রমে কিভাবে 'মারাত্মক' কিংবা সুভাষণের পর্যায়ে পৌঁছে, বলার ভঙ্গিই তা নির্ধারণ করে দেয়" (আজাদ, ১৯৯৪: ৩০১)। বাংলা ভাষাকে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুভাষিত করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। সুভাষণ একটি ভাষাগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তবে সুভাষণের ব্যবহার সামাজিক অবস্থা, লিঙ্গ, বয়স, পেশা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে (*Studies in Sociology of Science,* 2013:45-48)। এ প্রবন্ধের শেষ বাক্য বাংলা ভাষার জন্য আজও একই রকম আবেদনময় "ভাষার সাহায্যে এ ধরনের সমাজমনের পরিচয় পেতে হলে রীতিমত গবেষণা করা দরকার"।

৫.১৯ তোষামোদের ভাষা

"তোষামোদের ভাষা", যা সমাজভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি বিষয়। সমাজে নানা শ্রেণির মানুষের মধ্যে নির্ভরশীলতা এবং মুখাপেক্ষিতার কারণে একে অন্যকে কথার মাধ্যমে প্রভাবিত করতে চায় । মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থই বলেছেন "...কথা এমনি জিনিস যে ভালো করে বলতে পারলে মানুষের যেমন মন হরণ করা যায়, তেমনি ঠিকমত বলতে না পারলে রস কথাও বিরস হয়ে যায়"(আজাদ, ১৯৯৪: ৩০৪)। তোষামোদের ভাষা বলতে তিনি বোঝাতে চান এমন ভাষা, "মানুষের মন জয় করার জন্যে সমাজে কালে কালে কথার যে বিশেষ রূপটি সৃষ্টি করেছে তাকেই আমি তোষামোদের ভাষা বলতে চাই" (আজাদ, ১৯৯৪:৩০৪)। তোষামোদের ভাষাকে তিনি চমৎকার উপমার সাহায্যে বুঝিয়েছেন, "সহজ কথায় মানুষের মনের উপর বড়শিফেলা"। তবে এ ভাষা মানুষের বুচি ও ব্যবহারভেদে স্থুল কিংবা সূক্ষ্ম হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে, তোষামোদের পরিমিত ব্যবহারই আসলে প্রশংসা, আর তা সুশোভিত হয়ে বন্দনাতে পরিণত হয়। তোষামোদ, স্তুতি, প্রশংসা কিংবা বন্দনা– শব্দগুলো রুচি ও পরিমিতির তারতম্য অনুসারে অর্থ পরিগ্রহ করে। তোষামোদ অতি সূক্ষ্ম এক শিল্প, একে কলা হিসাবেও দেখা যেতে পারে, যা দিয়ে সমাজের অতি বুদ্ধিমান শ্রেণির মানুষ সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করে। এটি প্রাকৃতিকভাবে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় না, বরং চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে আয়ত্তে আসে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তা প্রয়োগ করা হয়, কারণ একজন মানুষকে বশীভূত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র শনাক্ত করাটাই দুরুহতম কাজ। কেউ তুষ্ট হয় রূপের প্রশংসায়, কেউবা গুণের। আমরা মানি আর না-ই মানি, এই পৃথিবী সফল তোষামোদকারীদের জন্য স্বর্গরাজ্য। এটি অত্যন্ত প্রাচীন এক শিল্প বা কলা, তোষামোদের দ্বারা কার্যসাধন চেষ্টা বহুকাল প্রাচীন। তোষামোদ শুধু মুখের ভাষার দ্বারাই হয়ে থাকে, তা নয়, চোখের দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গি, ইশারার ইত্যাদি অবাচনিক (non-verbal) মাধ্যমেও তোষামোদ করা যেতে পারে। মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই তোষামোদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হয়েছে, রাজদরবারগুলোতে সভাকবির রাজতোষণকারী কবিতার সুমিষ্ট পংক্তিমালাই

তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে ইশপের গল্পে বর্ণিত কাক ও শেয়ালের কাহিনি হলো তোষামোদের ভাষার ব্যবহার ও ব্যবহারকারীর মিথ্যাচারের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধির প্রাচীনতম ও উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। প্রশংসামাত্রই তোষামোদ নয়, প্রশংসা স্বতস্ফূর্ত এবং আন্তরিক একটি বিষয়। তোষামোদকারী সমাজের জন্য অনিষ্টকারী, কারণ তোষামোদের গর্ভে দুর্নীতির জন্ম। ভাষার বিনীতরূপ (politeness)- এর সাথে তোষামোদের ভাষাকে মিলিয়ে ফেলা যাবে না, বিনয় ঘনিষ্ঠভাবে সুভাষণের সাথে জড়িয়ে আছে।

৫.২০ রাজনীতির ভাষা

'রাজনীতির ভাষা' একটি নির্দিষ্ট পেশাজীবী সম্প্রদায়ের ভাষা। সমাজভাষাবিজ্ঞানে একে রেজিস্টার বা পেশাজীবীদের ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। এ ভাষা নির্দিষ্ট একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।। এই ধরনের ভাষায় নির্দিষ্ট শব্দভান্ডার থাকে, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই "ভাষা সম্প্রদায়" শব্দজোড়টি ব্যবহার করেননি, তবে "পারস্পরিক সহযোগিতা" প্রসঙ্গের অবতারণা স্পষ্ট করে দেয়, তিনি ভাষা সম্প্রদায়ের ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। আবার বিভিন্ন সমাজোপভাষার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় কারণ তাঁর মতে "....সমাজজীবনের বিচিত্র পরিবেশে ভাষারও বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করি" (আজাদ, ১৯৯৪: ৩১২) । তিনি রাষ্ট্রভেদে রাজনীতির ভাষার স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে ও "রাজনীতির প্রয়োজনে" ভাষায় নানা ধরনের শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয় এরকম অসংখ্য শব্দও ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ভাষার সুচতুর ব্যবহার অপরিহার্য বলেই তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে "১৯৩৯ সালে জার্মানী যেদিন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সেদিনকার হিটলারের জার্মান ভাষায় বেতার বক্তৃতা শুনে জার্মানরা তো দূরের কথা, আমরা যারা জার্মান ভাষা জানিনা, তাদেরও রোমকূপ শিউরে উঠেছিল এবং যুদ্ধের নেশায় মনপ্রাণ মেতে উঠেছিল" (আজাদ, ১৯৯৪: ৩১৪)। বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাষার জাদুকরী প্রভাবের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের অসাধারণ বক্তৃতা। রাজনীতিতে ভাষার যথাযথ ব্যবহার রাজনীতিবিদের জন্য স্বার্থসিদ্ধির বাহন হয়ে ওঠে কিন্তু শালীনতা বিবর্জিত ভাষা "অচিন্তনীয়ভাবে নীচে নেমে যায়" (আজাদ, ১৯৯৪: ৩২০)। অত্যন্ত রূঢ় হলেও সত্যি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অশালীন ভাষার ব্যাপক ব্যবহার প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। রাজনীতির ভাষা প্রকৃতপক্ষে 'ভাষা ও ক্ষমতা'র অন্তর্গত একটি বিষয়, যার মাধ্যমে অন্যকে শারীরিক জোরজবরদস্তি ছাড়াই কোনো কাজে নিয়োজিত করা যায় কিংবা তার চিন্তা জগতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা যায়। রাজনীতিবিদদের কথা বলার মূল উদ্দেশ্য শুধু কথোপকথন নয়, বরং তাঁরা রাজনৈতিক কোনো লক্ষ্য সামনে রেখেই কথা বলে থাকেন। রাজনীতিবিদগণ ভাষার মাধ্যমে জনতার সাথে একাত্মতা

প্রকাশের সাথে সাথে সামাজিক একটি বন্ধনও তৈরি করতে সচেষ্ট থাকে। তবে রাজনীতির ভাষা প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখিত ভাষার গুরুত্বও নির্দেশ করেছেন, বিশেষত সংবাদপত্রের ভাষার বেশ কিছু উদাহরণ টেনে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই ভাষাকে অনায়াসে পক্ষপাতিত্বমূলক ভাষায় পরিণত করা যায় । অন্যান্য গণমাধ্যমও "ভাষাকে মারাত্মক শক্তশালী করে তুলেছে" এবং আদর্শহীন রাজনৈতিক উদ্দেশে ভাষা ব্যবহারে তা শালীনতা হারিয়ে খেউড়ে পরিনত হতে পারে। রাজনীতির ভাষা বিশ্লেষণে ভাষার অবাচনিক দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, শরীরের ভাষা (body language) অনেকক্ষেত্রে মুখের ভাষার চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে।

৬. মূল্যায়ন

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রথম জীবনের রচনাবলী নিয়ে সংকলিত *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বিচিত্র স্বাদের রচনার একটি সংমিশ্রণ। গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলোর সময়কাল ১৯৪০–১৯৫৮ সাল। এই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহসহ নানা রাজনৈতিক সংকটে পুরো বিশ্ব ছিল টালমাটাল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ঘটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– ভারত বিভাজন। এই ভারত বিভাজন জনিত প্রতিক্রিয়া খুব সাধারণভাবেই এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংকটকাল এবং দেশ বিভাজন –এই দুটি ঘটনাই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মানসজগতে অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু জনতা, জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তা এবং অস্তিত্ব-সংকট মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলে। এ সময় ছিল অসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ ও বৈষম্য ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈরী ও সর্বগ্রাসী মনোভাব মানুষকে করে তুলেছে বিপন্ন, এই বিপন্নতাই সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সময়ের সাহিত্যচর্চা গ্রামীণ সমাজ-নির্ভর হলেও মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনাসমূহ মূলত শহর-কেন্দ্রিক। "বাংলাদেশের সংবেদনশীল শিল্পিচৈতন্য মূলত এদেশের আবহমান গ্রামজীবনেই সন্ধান করেছেন তাদের শিল্পের বিষয়। গ্রামীণ সমাজের মর্মমূলে বিরাজিত সীমাহীন দারিদ্র-বৈষম্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় চাপে নিপীড়িত গোষ্ঠীগত মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রাম, অসম উৎপাদন সম্পর্কের কারণে নির্বিত্ত মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা, সমাজপতি কর্তৃক প্রান্তিক মানুষদের ক্রমাগত নিঃস্বকরণ প্রভৃতি বিচিত্র সঙ্কট উপন্যাসের মতো ছোটো গল্পেও বিধৃত হয়েছে" (মোরশেদ, ২০০৭: ৪১৪)। এ গ্রন্থের ছোট গল্পগুলো ইঙ্গিত দেয় সৃষ্টিশীল রচনার প্রতি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

৭. উপসংহার

ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুহম্মদ আব্দুল হাই ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চায় তাঁর অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রাখলেও সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর তত্ত্বগত ও

কাঠামোবদ্ধ বিশদ আলোচনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির নামকরণ থেকে এর অন্তর্গত রচনাসমূহে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গভীর দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনা মনে উঁকি দিলেও বাস্তবে তা অনুপস্থিত। এতে গ্রন্থিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলো মূলত সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের দিকটি পরিষ্কার অনুধাবন করা যায় এবং বলা যায় চিন্তা-ভাবনায় তিনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, কারণ ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখা সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকক্ষেত্র ও প্রণালী-পদ্ধতি তখনও সুস্পষ্ট ছিল না। আলাপচারিতার ঢঙে ভাষাবিজ্ঞানের নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলেও প্রবন্ধের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং সাধারণ পাঠকের কাছে তা সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার গভীরতার নিরিখে অপর্যাপ্ততা পীড়াদায়ক হলেও সমাজভাষাবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ বিষয়ের অবতারণা পরবর্তী গবেষণাক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা অনস্বীকার্য, উনিশ শতকের ছয়ের দশকে বিকশিত ভাষাবিজ্ঞানের নতুন শাখা সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপনায় তাঁর অতুলনীয় মুন্সিয়ানা পাঠককে মুগ্ধ করে।

অন্ত্যটীকা

১. এই প্রবন্ধটি ২৬ শে নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত এবং ঈষৎ পরিবর্তিত।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পাদিত, ১৯৯৪): *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, খণ্ড-২। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আলী, মুন্সি মোয়াজ্জম (১৯৪৫): *আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী*। ঢাকা: হামিদিয়া প্রেস।

ইসলাম, সিরাজুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ২০০৩): *বাংলাপিডিয়া*। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ।

চৌধুরী,অন্তরা (২০২৩): "বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী" *Trisangam International Refereed Journal,* Vol-3, Issue-iv, October 2023

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১): 'বিচিত্রিতা', *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড-৯। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১): 'মরণ', *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড-৩। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১): 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড-১২। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৪): আমি, শ্যামলী, *সঞ্চয়িতা*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

দাশ, জীবনানন্দ (২০২৪): *কবিতাসমগ্র।* ঢাকা: সালাউদ্দিন বইঘর।

দাস, মনোজিৎকুমার (২০১৯): শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত দাস, ঘুংঘুর, ইউএসএ: টেনেসি।

নন্দী, সুধীর কুমার (২০২০): *নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাবাজার।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত, ২০০০): *মুহম্মদ আবদুল হাই: স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পাদিত, ২০০৭): *ভাষা ও সাহিত্য*, খণ্ড-৬। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ।

রহমান, মো. জিল্লুর (২০২৪): "দখল ও দূষণে বিপন্ন নদী ও পরিবেশ" *যায় যায় দিন*, ১৮ মার্চ, ২০২৪

রায়, নীহাররঞ্জন (২০১৩): *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ২০২৩): *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*। ঢাকা: বাংলা বিভাগ ও বাংলা অ্যালামনাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হক, সৈয়দ আজিজুল (সম্পাদিত, ২০২২) *শতবর্ষে বাংলা বিভাগ*। ঢাকা: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হোসেন, মো. শওকত (২০১৭): "লিও টলস্টয়ের শিল্পদর্শন: একটি নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা" *Jahangirnagar University Studies in Philosophy*, Vol. XXXIV, June 2017

হোসেন, মো. শওকত (২০১৭): *নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা: তিথি পাবলিকেশন।

Ruskin, John (1894): *Modern Painters*, Vol-1 New York: Bryan, Taylor & Company

Ren, chi & Yu Hao (2013): Euphemism from sociolinguistics perspective in *Studies in Sociology of Science* , Canadian Research & Development Center of Sciences and Culture.